শিবনারায়ণ রায়

ব্যতিক্রমী এক চরিত্র

রবীন্দ্রনাথ তাঁর বর্ণময় পূর্বজ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রতি সম্মান জ্ঞাপনের সূত্রে প্রকাশ্য সভায় মন্তব্য করেছিলেন যে, তিনি বিস্মিত হন এই ভেবে ঈশ্বরচন্দ্রের মতো একজন অদম্য চরিত্রের মানুষ কি করে অসম্মান ও গোলামিতে অভ্যস্ত এই বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন! বাঙালির পরিচিত মেরুদণ্ডহীনতার সঙ্গে বিদ্যাসাগরের চরিত্রের প্রতিতুলনা অত্যন্ত সঠিক। তিনি তো লিখেইছিলেন সাত কোটি সন্তানের হে মুগ্ধ জননী রেখেছো বাঙালি করে মানুষ করনি। বঙ্গভূমির সেই সময়কার পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ বাঙালি চরিত্রে দৃঢ়তা বিষয়টি অনুপস্থিতির দ্বারাই বিশেষভাবে প্রকটিত হত।

রবীন্দ্রনাথ সেই সময় লক্ষ্য করেননি কিন্তু পরবর্তী সময়ে সম্পূর্ণভাবে অনুভব করেছিলেন যে ১৮২০ সালে বিদ্যাসাগরের জন্মের আগে থেকেই অত্যন্ত সম্ভাবনাময় সাংস্কৃতিক বিপ্লব বাংলার বুকে শুরু হয়ে গিয়েছিল। মিসনারি বা ব্যবসায়ীরাই শুধু নয়, উর্বর একটি সংস্কৃতি জমি প্রস্তুত করবার জন্য ইয়োরোপের রেনেসাঁর বীজ ইতিমধ্যেই বাংলায় পৌঁছেছিল। ইয়োরোপীয় এনলাইটেনমেন্টের প্রতিভূ স্বরূপ উইলিয়ম জোন্‌স কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এসিয়াটিক সোসাইটি (১৭৪৬-৯৪) তারই একটি বৃহৎ উদাহরণ। সেরকমই আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল চার্লস উইলকিন্‌স (১৭৫০-১৮৩৬) প্রতিষ্ঠিত ছাপাখানা। এরপরই আবির্ভূত হলেন রাজা রামমোহন (১৭৭২-১৮৩৩) বাংলার রেনেসাঁর সার্বজনীন প্রাণপুরুষ।

ধর্মীয় তাত্ত্বিকতার নিদর্শন Tuhfat-ul-Muwahiddin-এর বুদ্ধিদীপ্ত সমালোচনা এবং প্রাচীন হিন্দু সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে তীব্র প্রচার অভিযান দিয়ে তাঁর আবির্ভাব। রামমোহনের পূর্বে এসেছিলেন হেন্‌রি লুইস ভিভিয়ান ডিরোজিও এবং তাঁর 'ইয়ং বেঙ্গল' শিষ্যকুল। তাঁরা সমস্ত রকমের পরম্পরা শাসিত আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলেছিলেন এবং যুক্তির আলোয় জীবনকে বিশ্লেষণ করতে চেয়েছিলেন। ডিরোজিও এবং ইয়ং বেঙ্গলের আন্দোলন ১৮২০-৩০ সাল জুড়ে কলকাতার সাংস্কৃতিক জীবনকে উত্তাল করে তুলেছিল। দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তান ঈশ্বরচন্দ্র বীরসিংহ গ্রাম থেকে কলকাতা মহানগরীতে এসে বিবিধ প্রতিকূলতার মধ্যে পড়েছিলেন। কিন্তু তার প্রথম কাজ ছিল সংস্কৃত কলেজে সার্থকভাবে পড়াশুনো শেষ করা এবং জীবিকার জন্য একটি কাজ জুটিয়ে নেওয়া। ২০ এবং ৩০-এর দশকের কলকাতা বিদ্বৎ সমাজের আন্দোলন তাকে নাড়া দিয়ে গেলেও সে সময় তিনি নিজস্ব লেখাপড়াতেই মনোনিবেশ করেছিলেন এবং বিদ্যাসাগর উপাধি লাভ করেছিলেন। ইতিমধ্যে রামমোহন এবং ডিরোজিও দু'জনেরই প্রয়াণ ঘটেছে এবং 'ইয়ংবেঙ্গল আন্দোলন'ও অস্তমিত। ঈশ্বরচন্দ্রকে সুতরাং পরম্পরা শাসিত প্রথানুগত এবং চিন্তার ক্ষেত্রে প্রায় মৃতবৎ সমাজের সংস্কারের উদ্দেশ্যে এককভাবে আন্দোলনে নামতে হয়েছিল।

ঈশ্বরচন্দ্রের সামনে প্রথম কাজ ছিল বঙ্গীয় রেনেসাঁর জন্য তাঁকে যে ভূমিকা পালন করতে হবে তার জন্য নিজেকে তৈরি করা এবং প্রস্তাবিত রেনেসাঁর জন্য নির্দিষ্ট নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করা। তিনি ইতিমধ্যেই ধ্রুপদী সংস্কৃত ভাষা সুচারুরূপে শিক্ষা করেছিলেন এবং ঐ ভাষায় রচিত সমৃদ্ধ সাহিত্যে অবাধ বিচরণ করেছিলেন, সেইসঙ্গে একথাও উপলব্ধি করেছিলেন যে, দ্রুত অগ্রগতি সম্পন্ন বৈজ্ঞানিক জ্ঞানভাণ্ডারে প্রবেশ করতে এবং শাসক ইংরেজদের সঙ্গে একই মর্যাদার কাজ করতে হলে ইংরেজি অপরিহার্য। তাঁর মতো একজন অনন্য মেধাসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে এ ভাষায় দক্ষতা অর্জন কোনো সমস্যা ছিল না। বিদ্যাসাগরকে তার ভূতপূর্ব প্রতিষ্ঠানের অ্যাসিসট্যান্ট সেক্রেটারির পদে অনুমোদন করে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সেক্রেটারি ক্যাপটেন মার্শাল লিখেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র শুধুমাত্র 'সংস্কৃত কলেজে সাহিত্য এবং বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায়—দক্ষতার সঙ্গে পাঠ গ্রহণ করেছেন' তা নয়, "তিনি নিজের চেষ্টায় ইংরেজি ভাষার উপরও প্রভূত জ্ঞান অর্জন করেছেন।" বিদ্যাসাগর অবশ্য উপলব্ধি করেছিলেন যে ইংরেজি ভাষার লব্ধ জ্ঞান এ দেশের অল্পবয়সী বিদ্যার্থীদের জন্য মাতৃভাষার মাধ্যমে সম্প্রচারিত করতে হবে। এ কারণে বাংলাভাষাকে সঠিকভাবে সমৃদ্ধ ও উন্নত করতে হবে। তাঁর সৃষ্টিশীলতা ও বিরামহীন প্রচেষ্টা বাংলা গদ্যসাহিত্যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনল। বাংলা ভাষার মাধ্যমে সহজেই আধুনিক চিন্তা ও অনুভূতিকে প্রকাশ করা যেতে লাগল। এই অর্থে বিদ্যাসাগর সত্যিই বাংলাভাষার জনক। তিনি যে ভিত স্থাপন করে গিয়েছিলেন, তার উপর দাঁড়িয়েই বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে বিশ্বস্তরের সাহিত্য-ভাষা সৃষ্ট করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

শিক্ষক হিসেবে শিক্ষার্থীদের চরিত্র ও বক্তিত্ব গঠনে অনুকরণীয় ব্যক্তির (মডেল) গুরুত্ব তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। যে সমস্ত ব্যক্তিকে মডেল হিসেবে শিক্ষার্থীদের জন্য তিনি বেছে নিয়েছিলেন, অনুমান করা যায় যে, এঁরা সকলেই তাঁর নিজের অল্পবয়সের মডেল ছিলেন। তাঁর 'জীবন চরিত' নামক পুস্তকে তিনি যে চরিত্রগুলির সমন্বয় ঘটিয়েছিল তা চেম্বারর্স এক্সজেমপ্লারি বায়োগ্রাফির উপর নির্ভর করেই করেছিলেন। তিনি তার ছাত্রদের জন্য যে অনুকরণীয় চরিত্রগুলি তুলে ধরেছিলেন সেগুলি হল কোপারনিকাস, গ্যালিলিয়, নিউটন, গ্রোটিয়াস এবং স্যার উইলিয়ম জোন্‌স। এটা উল্লেখযোগ্য যে তিনি ভারতীয়দের মধ্যে একজনকেও মডেল হিসেবে খুঁজে পাননি। বইটির মুখবন্ধে তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন বিশেষ কতগুলি গুণাবলির নিরিখেই তিনি চরিত্রগুলি বেছে নিয়েছিলেন। গুণাবলিগুলি হল ক্লান্তিহীন কঠোর পরিশ্রম, প্রবল উৎসাহ, অসীম ধৈর্য্য এবং জ্ঞান ও সমাজের মঙ্গলের জন্য জীবন উৎসর্গ করা। বঙ্গদেশের পুনরুজ্জীবনের জন্য, বাঙালি চরিত্রে দৃঢ়তার অনুপ্রবেশ ঘটাবার জন্য যে দুটি প্রয়োজনীয় জিনিসের উপর তিনি জোর দিয়েছিলেন তা হল জ্ঞান এবং সামাজিক মঙ্গল সাধন।

স্নাতক সম্মান লাভের দশ বছর পর তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োজিত হন। এই সময় তিনি তার কর্মসূচির দ্বিতীয় কাজটিতে হাত দেন। তিনি তৎকালীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির প্রকৃত অবস্থার উপর একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করলেন এবং সেগুলির আধুনিকীকরণের জন্য কিছু প্রস্তাব তৈরি করলেন।[৮] পরবর্তী দু বছর ধরে তিনি ব্যস্ত রইলেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির পুনঃগঠনের কাজে। সে সময়ে বেনারসের সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন ড: জে ব্যালানটাইন। তাঁকে সরকারের পক্ষে নিয়োজিত করা হল কলকাতার সংস্কৃত

কলেজের পরিদর্শনের কাছে। শিক্ষা সংস্কারের বিষয়ে তাঁকে কিছু সুপারিশ রাখতেও বলা হল। ব্যালানটাইন যে প্রস্তাবগুলি রাখলেন সেগুলি ছিল পশ্চাৎমুখী এবং চিরাচরিত। বিদ্যাসাগরের এই প্রস্তাবগুলির বেশিরভাগই পছন্দ হল না ফলে ব্যালানটাইনের সঙ্গে তার মতপার্থক্য হল। বিদ্যাসাগর যে সুপারিশগুলি যুক্ত করলেন বঙ্গ রেনেসাঁর ক্ষেত্রে তা অত্যন্ত মূল্যবান নথি।

ঈশ্বরচন্দ্র যে সংযুক্তি আনলেন তার মূল প্রতিপাদ্য সংক্ষেপে এরকম : সংস্কৃত কলেজেও ইংরেজির চর্চা অপরিহার্য। মধ্যযুগের অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকতে না চাইলে ইংরেজি ভাষার চর্চা করা উচিত কেননা, ব্যালেনটাইন কৃত 'পশ্চিমী সত্য' ও 'প্রাচ্যের সত্য' বিভাজনটি নিতান্ত অনর্থক। কেননা জ্ঞানের সঙ্গে সম্পৃক্ত সত্য হচ্ছে সার্বজনীন। শিক্ষার প্রাথমিক সত্য হওয়া উচিত ছাত্ররা যাতে নিজের মস্তিষ্ককে প্রয়োগ করতে পারে নিজস্ব যুক্তি বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার সাহায্যে। তিনি জোরের সঙ্গে বলেছিলেন যে সাংখ্য এবং বেদান্ত এই দুই দর্শনই অমূলক। এই দুটি দর্শন যেহেতু সংস্কৃত কলেজের পাঠ্যক্রমভুক্ত তাই এর প্রভাবও ছাত্রদের উপর রয়ে যায়। অতএব এর বিপরীত যুক্তিসমৃদ্ধ দর্শন ও পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রয়োজন। সুতরাং তাঁর যুক্তি ছিল পাশ্চাত্য পাঠক্রমের দর্শন ও পাঠ্যসূচির মধ্যে থাকা প্রয়োজন। সুতরাং ঈশ্বরচন্দ্র মত প্রকাশ করলেন যে জন স্টুয়ার্ট মিলের 'লজিক' পাঠ অপরিহার্য। সংস্কৃত ভাষার গুরুভার লাঘব করতে তিনি প্রস্তাব রাখলেন বাংলা ভাষায় সংস্কৃত পড়ানো হোক। তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণের সহজ পাঠ প্রস্তুত করে ছাপালেন। অন্যদিকে অঙ্কশাস্ত্র পাঠের মাধ্যম হিসেবে সংস্কৃতের দেশে তিনি ইংরেজি ভাষার প্রয়োগ করলেন এবং ইংরেজি ভাষাকে অবশ্য পাঠ্য হিসেবে রাখলেন। ইতিহাস, অঙ্কশাস্ত্র, প্রাকৃতিক নৈতিক এবং মানসিক দর্শন, তর্কশাস্ত্র এবং রাজনৈতিক অর্থনীতির পাঠও ইংরেজি ভাষায় করবার ব্যবস্থা নিলেন।

ব্যালেনটাইনের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের মতপার্থক্য ছিল মৌলিক। তিনি পরিষ্কার করে বললেন যে নিয়োগকর্তার মতানুসারে চলবার জন্য তিনি চাকরি করছেন না। সরকার তার প্রস্তাবের যুক্তির সত্যতার প্রশংসা করেছিল। এরপর অবশ্য প্রায় একার হাতে তাঁকে শিক্ষার সংস্কারের কাজে আত্মনিয়োগ করতে হয়েছিল।

উপযুক্ত এবং যোগ্য শিক্ষকই একমাত্র পারেন ছাত্রদের মধ্য থেকে তাদের সেরাটি বের করে আনতে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যথাযথ জ্ঞান অর্জন এবং অগ্রগতি সম্পর্কে প্রত্যেক শিক্ষকেরই ওয়াকিবহাল থাকা উচিত। সমাজের বাকি সব ব্যক্তিরা যে সমস্ত কুসংস্কারে আচ্ছন্ন শিক্ষকদের সেগুলি থেকে মুক্ত থাকতে হয়। প্রয়োজনীয় আধুনিক জ্ঞানভাণ্ডারকে সঠিকভাবে অনুধাবন করতে হলে তাদের ইংরেজি ভাষায় দক্ষ হতে হবে। সেইসঙ্গে তাদের সংস্কৃত ভাষাতেও আরও দক্ষতা অর্জন করতে হবে কেননা এ ভাষায় অশেষ সাহিত্যিক সমৃদ্ধির সঙ্গে দ্রুত ধাবমান চিন্তা ভাবনা, কারিগরি জ্ঞান ও তথ্যের মিলন ঘটানো প্রয়োজন। এই শিক্ষকেরাই, তিনি মানস চক্ষে দেখতে পেতেন, বাংলার রেনেসাঁর পথিকৃতের ভূমিকা পালন করবে।

এই শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য একটি 'নর্মাল স্কুল' অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ঈশ্বরচন্দ্রের সুপারিশে যে সময়ের অত্যন্ত মৌলচিন্তক অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৩৬) এই নর্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হলেন। বিদ্যাসাগর এই ভাবে আরও অনেকগুলি নর্মাল স্কুল স্থাপন করলেন। তার মধ্যে নদিয়া, বর্ধমান এবং হুগলিতে পাঁচটি করে এবং মেদিনীপুরে চারটি স্কুল স্থাপিত হল।

এই প্রতিভাধর এবং গভীর চিন্তার আধিকারী মানুষটি বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর লালিত স্বপ্ন ও আরব্ধ কর্মসূচীর যথার্থ বাস্তবায়ন কোনোদিনই ঘটবে না যদিনা অবিচার ও দাসত্ব থেকে এদেশের নারী মুক্তি পায়। ইতিপূর্বে রাজা রামমোহন রায় সতীদাহ প্রথাকে বেআইনি ঘোষণা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর অনুভব করলেন যে হিন্দু সমাজের অধঃপতনের, বিশেষত হিন্দু রমণীদের চরম পরিস্থিতির, অন্যতম প্রধান কারণ হল বাল্যবিবাহ। ১৮৫০ সালে তিনি বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে জোরালো কলম ধরলেন। কিন্তু এর প্রভাব খুব একটা সফলতা পেলনা। কিন্তু এরপর ১৮৫৫ সালে বিধবা বিবাহকে আইনি স্বীকৃতি দেবার পক্ষে তিনি দুটি প্রবন্ধ ছাপালেন। এবার সংকীর্ণ হিন্দু সমাজের মৌচাকে ঢিল পড়ল। যদিও বিধবা বিবাহের ব্যাপারে তাঁর শাস্ত্রসম্মত ও হার্দিক আবেদন ছিল মঙ্গলবোধ, দয়া ইত্যাদি মানবিক গুণাবলির নিকটে। তিনি হিন্দু ধর্মশাস্ত্র থেকেও প্রচুর যুক্তির অবতারণা করে দেখালেন যে হিন্দু ধর্মেও বিশেষ কোনো কোনো পরিস্থিতিতে হিন্দু বিধবা রমণীর পুনঃবিবাহ অশাস্ত্রীয় নয়। এবার তিনি হিন্দু বিধবা রমণীর বিবাহের আইনি স্বীকৃতির জন্যে একটা খসড়া প্রস্তুত করে আবেদন জমা দিলেন। ৯৮৭ জন মানুষ এই আবেদনে সই করেছিলেন। রাধাকান্ত দেব, যিনি ইতিপূর্বে রামমোহন এবং ডিরোজিওর সংস্কারে বাধা দিয়েছিলেন এবার তাঁর নেতৃত্বেই বিরোধিতা সংগঠিত হল। রাধাকান্তর নেতৃত্বে বিরোধিতার দরখাস্তে সই করলেন ৩৬৭৬৩ জন মানুষ। এই ঐতিহাসিক ঘটনার নথি দিল্লির ন্যাশনাল আরকাইভে রাখা আছে। নথি থেকে জানা যাচ্ছে যে বিরোধীদের দরখাস্তে বাংলার মানুষের সই শুধু ছিল না; মহারাষ্ট্র, গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ থেকেও সই সংগ্রহ করা হয়েছিল। কিন্তু রাধাকান্তর এত জনসমর্থন থাকা সত্ত্বেও জয়ী হলেন বিদ্যাসাগর। পাস হয়ে গেল বিধবা-পুনঃবিবাহ বিল। বিদ্যাসাগর বললেন এটা 'আমার জীবনের সবচেয়ে নৈতিক উৎকর্ষসম্পন্ন কাজ'। এ প্রসঙ্গে তিনি তাঁর সহোদর শম্ভুচন্দ্রকে লিখেছিলেন, "আমি আমার দেশের প্রথা ও কুসংস্কারগুলির দাস নই। আমার ভালোর জন্য এবং সমাজের মঙ্গলের জন্য যা করা প্রয়োজন বলে মনে হয় আমি তাই করব। কোনো আত্মীয় কিংবা কোনো মানুষের ভয়ে আমি আমার কর্তব্য থেকে চ্যুত হব না।"

এই ঋজু মানুষটির প্রতিই রবীন্দ্রনাথ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছিলেন। কিন্তু ব্যক্তিগত এই নিষ্ঠার জন্য বিদ্যাসাগরকে অনেক দাম দিতে হয়েছিল। এত প্রচার সত্ত্বেও খুব কম যুবকই বিধবা বিবাহে সম্মতি দিয়েছিল এবং যে অল্প সংখ্যক যুবক বিধবা বিবাহ করেছিলেন তাদের বিবাহ ব্যয় ও পরিবার প্রতিপালনের দায়িত্ব এই মহৎ মানুষটিকে নিতে হয়েছিল। উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলনের আন্দোলন একেবারেই সফলতা পায়নি। বিদ্যাসাগরের নিজস্ব ছাপাখানা, ব্যক্তিগত এবং অন্যান্য প্রকাশনা থেকে রোজগার ছিল বলে এ সমস্ত কাজ করেও তিনি টিকে থাকতে পেরেছিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র আধুনিক শিক্ষার প্রসারের উপর আশা রেখেছিলেন। মডেল স্কুলগুলি প্রতিষ্ঠা ব্যতিরেকেও তিনি হুগলি, বর্ধমান, মেদিনীপুর ও নদিয়ায় মেয়েদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করলেন। এরপর একসময় যখন তিনি উপলব্ধি করলেন যে সরকার মেয়েদের শিক্ষার জন্য ব্যয় করতে আগ্রহী নয় তখন তিনি সরকারি চাকরিতে ইস্তফা দিলেন। ব্যক্তিগত সঞ্চয় এবং যোগাযোগকে কাজে লাগিয়ে ব্যক্তিগত উদ্যোগে এবার তিনি নারী-শিক্ষার কাজ এগিয়ে নিয়ে

যেতে লাগলেন। তাঁর শিক্ষা সম্প্রচার ও সংস্কারের কাজ থেমে থাকেনি কিন্তু সত্তর ও আশির দশকে কলকাতার পরিবেশ পরিস্থিতি ক্রমশঃ পরিবর্তিত হচ্ছিল। যদিও তখনও পর্যন্ত ঈশ্বরচন্দ্র বাংলার সবচেয়ে মহান ব্যক্তিত্ব হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছিলেন কিন্তু পরম্পরা-শাসিত হিন্দু সমাজের থেকে তিনি ক্রমাগত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছিলেন। ১৮৬৬ সালে গাড়ি দুর্ঘটনায় তিনি যে আহত হয়েছিলেন তা থেকে সম্পূর্ণ আরোগ্য তাঁর ঘটেনি। কিন্তু তাঁর লৌহ দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি ক্রমশ ক্ষয় পাচ্ছিল বিচ্ছিন্নতাবোধের কারণে। তাঁর মতো অসাধারণ নিষ্ঠা, সাহস এবং ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিত্বের চারপাশে যারা ছিলেন তারা বেশিরভাগই অসৎ, দুর্বল চিত্তের মানুষ। শেষ অবধি তিনি তাঁর আত্মীয়স্বজন এবং সামাজিক কাজকর্ম থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছিলেন। যে তিনটি চিঠি তিনি তাঁর মা, বাবা ও স্ত্রীকে লিখেছিলেন তা থেকেই তাঁর শেষ জীবনের ক্লান্ত এবং তিক্ত মানসিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর মাতৃদেবী ভগবতী দেবী ছিলেন তাঁর প্রেরণার উৎস। সেই ভগবতী দেবীকে লেখা পত্রটি থেকে দু-এক ছত্র তুলে ধরা হল : "আর এক মুহূর্তের জন্য আমি কোনো পারিবারিক বিষয়ে অথবা পরিবারের কার সঙ্গে জড়িত হতে চাইনা—আমি আমার জীবনের বাকি দিনগুলি কোনো সুদূর অঞ্চলে কাটাব—কিন্তু যতদিন তুমি বেঁচে থাকবে ততদিন কোনো কারণেই প্রতি মাসে তোমাকে ৩০্ টাকা পাঠাতে আমার ভুল হবে না।"

তাঁর পোষ্যের সংখ্যা ছিল অগুন্তি। ১৮৭৫ সালে তিনি তাঁর শেষ উইলে বহু মানুষ ও প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর পুস্তক ও সম্পত্তি-র অর্জিত অর্থ থেকে মাসিক বরাদ্দ নির্দিষ্ট করে গিয়েছিলেন। তিনি অভাবী মানুষকে কোনোদিন ফিরিয়ে দেননি, তাঁর পোষ্যদের প্রতি দায়বদ্ধতার কথা ভুলে যাননি। সার্থকভাবেই দয়ার সাগর হিসেবে তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন। কিন্তু তিনি দিন দিন একা হয়ে পড়েছিলেন, তাঁর একাকিত্ব চরম সীমায় পৌছেছিল। শেষ পর্যন্ত তিনি কার্মাটাড়ের সরল এবং দরিদ্র সাঁওতালদের সঙ্গে জীবন কাটানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। দেশের মানুষের কাছে তিনি পূজিত হলেও তারা তাঁর চারিত্রিক গুণাবলি ও ন্যায়নীতিগুলি জীবনে গ্রহণ করেননি, তাঁর ঋজু এবং সুউচ্চ জীবনবোধকে মডেল হিসেবে বেছে নেননি—এটা বিদ্যাসাগরের নিজের এবং তিনি যাদের মধ্যে জীবন কাটিয়ে ছিলেন তাদের জীবনের এক মস্ত ট্রাজেডি। ১৮৯১ সালের ২৯ জুলাই তাঁর মৃত্যু হয়—নিশ্চয়ই স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্রেরও মনে হয়নি বড্ড তাড়াতাড়ি চলে গেলাম।

অনুবাদ : অপূর্ব দাশগুপ্ত

উল্লেখপঞ্জি :

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *বিদ্যাসাগর চরিত*।

২। এম. এন. রায়, *বেঙ্গল রেনেসাঁ, দ্য ফার্স্ট ফেজ*, ২০০০।

৩। স্যার উইলিয়ম জোন্স, *কালেক্টেড ওয়ার্কস*, ১৮০৭।